ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ২৪১-২৫২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4116

আইনে বাংলাভাষার ব্যবহার: একটি বিশ্লেষণ

ড. কাজী জাহেদ ইকবাল
আইনজীবী, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

Abstract: Even though Bengali is recognized as the state language of independent Bangladesh, the language had to go through a long bumpy road to achieve its current status. Before establishing the statehood of Bangladesh through liberation war, Bengali language was least used in the arena of legal practice due to lack of state patronization. After the liberation war, the Constitution was written in Bengali and that marked the initiation of using Bengali language in legal practices. However, such initiative was hindered due to various obstacles. Lack of sufficient terminologies is considered as one of the prominent obstacles. In order to increase the use of Bengali language, government circular has been declared and law has been introduced. Apparently, the attempt of using Bengali language in the legal arena has been accelerated. However, the obstacles are yet to be removed completely.

Key Words: Bengali language, Legal practice, Constitution, Law enforcement.

(১)

স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষার নাম বাংলাভাষা। দেশের সংবিধানে এ ভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এভাবে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'।[১] সুতরাং সকল রাষ্ট্রীয়কাজে অর্থাৎ অফিস আদালত সর্বত্রই সকল কিছু লিখিত হবে বাংলাতে; এটা সংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এখানে বলতে হবে যে, অন্যকোন ভাষার কথা বা দ্বিতীয় ভাষার কথা সংবিধান বলেনি'; তবে সংবিধানের একটি ইংরেজি অনুমোদিত পাঠ থাকবে সেটা বলা আছে।[২] বাংলাকে এ সাংবিধানিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা দিতে বাংলাভাষীদের দীর্ঘ লড়াই আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে। ভাষার অধিকার বা স্বাধীনতা সবখানেই ত্যাগ আর রক্ত দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাকে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ তুলতে হচ্ছে, আইন করতে হচ্ছে; তবুও বিতর্ক চলছেই। এমন কি স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছে দাঁড়িয়েও সে বিতর্ক থামছে না। বাংলা ভাষা হিসাবে দীর্ঘ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। চর্যাপদকে যদি আদি নিদর্শন ধরা হয় তবে সময়কালটা হাজার বছরের বেশিই হবে। নদীয়ার রাজসভার কবি ভারত চন্দ্র বলা যায় পুরানো বাংলা আর নতুন বাংলার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন।

আধুনিক বা বর্তমানে প্রচলিত বাংলার শুরু হলো ব্রিটিশ আমলে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন্দ্রিক পন্ডিতদের হাতে; বিশেষ করে পাদ্রি উইলিয়াম কেরীর অবদান অনবদ্য। সময় বললে ১৮০০ সালের দিকে শুরু বলা যায়। তবে বলা দরকার প্রথম গ্রামারের লেখক একজন পর্তুগিজ এবং দ্বিতীয়টি হেলহেড কর্তৃক লেখা। তারপরই রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বর্তমান পর্যায়ের উপনীত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত যে বাংলা আর বর্তমানে যে বাংলা প্রচলিত তার ভেতরও অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে বলা দরকার যে, চলিত ভাষায় লেখার চল শুরু হয় প্রমথ চৌধুরীর মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাভাষার এই বিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়ায় এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অভাব বা বানান বা বাক্য ব্যবহারের বিভ্রাট সব সময়ই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা হিসাবে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পায়নি সেভাবে কখনোই। সংস্কৃত, ফার্সি, ইংরেজি এবং উর্দু এভাবেই চলছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বা রাষ্ট্রের ব্যবহার্য ভাষা। সুতরাং বাংলাভাষাকে এগুতে হয়েছে প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন হলো এই প্রতিকূলতা অতিক্রমের চেষ্টার সর্বাপেক্ষা বড় নজির। সেটি বাঙ্গালির পরবর্তী অর্জনগুলোর ভিত্তিভূমিও।

বাংলাভাষার আধুনিক পর্ব শুরুর সময়ই এর প্রধান পুরুষেরা ভাষার বানানসহ ব্যবহারের শৃঙ্খলা নিয়ে সচেতন ছিলেন; এর গুরুত্বও বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সামনে অসুবিধা ছিল ভাষার পক্ষে রাষ্ট্রের আনুকূল্য না থাকা। ফলে বানান বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া বা একটি সর্বজনভিত্তিক নিয়ম-নীতি চালু করা কঠিনই ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় বিষয়টি এমনই ছিল।[৩]

> *কোন একটি প্রামান্য শাষনকেন্দ্র থেকে সাহিত্যের*
> *বানান প্রভৃতি সমন্ধে কার্যবিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকা*
> *একান্ত দরকার। আইন বানাবার অধিকার তাদেরই*
> *আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাদের হাতে।*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক বাংলার শুরু থেকেই বৈরী পরিবেশ ভাষাকে শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুগভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে খুবই প্রতিবন্ধক ছিল। এ প্রবন্ধে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো বর্তমানে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার এবং ভাষা রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব আইন-কানুন আছে তার অবস্থা কীরকম।

(২)

উপরের ভূমিকা স্বরূপ অংশটির পর এখানে আমরা প্রবন্ধের কারণ, উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করব। বর্তমান প্রবন্ধটিতে আমরা দেখতে চাই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে বাংলা সত্যিকারভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে কি না? পাশাপাশি দেখা হবে ভাষাটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হলো কিনা? সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়

প্রয়াস সহ এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াটিও দেখা হবে। সার্বজনীনভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো বিবেচিত হবে।

শৃঙ্খলার স্বার্থে ভাষানীতি এবং ভাষা পরিকল্পনার দিকটিও দেখব। সবচেয়ে বড় কথা হলো বর্তমানে বাংলাদেশে ভাষা সর্বত্র ব্যবহারে জন্য প্রয়োজনীয় আইন বিদ্যমান, কিন্তু তারপরও ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সুষ্ঠুমত করা যাচ্ছে না এবং বিতর্কও চলমান থাকছে নানাভাবে নানা কারণে। সবই আলোচিত হবে সংক্ষিপ্তভাবে। বর্তমান প্রবন্ধটির গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে *ইমপিরিকাল মেথড* ব্যবহার করা হয়েছে। উৎস হিসাবে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে দ্বৈতয়িক উৎসসমূহ যেমন বিভিন্ন গবেষকের গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য উপাত্ত।

(৩)

ভাষা নিয়ে কথা বলতে হলে প্রথমে এর বিবর্তনের দিকটি একটু দেখতে হবে বিশ্লেষণমূলকভাবে। কেননা তার মাধ্যমেই অনুধাবন করা যাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন বাংলাভাষা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাকে ভাষা হিসাবে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের বাইরেই টিকে থাকতে হয়েছে জনগণের ভাষা হিসাবে। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করার বিষয় এমনটা হয়েছে অর্থাৎ যে অঞ্চলের প্রায় সবাই বাঙালি সেখানে মানুষের মুখের ভাষা এবং রাষ্ট্রের ভাষা ভিন্ন। সে ভিন্নতা চলেছে শতশত বছর ধরে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ ধরলে এর শুরুর বয়স হাজার বছরের বেশী। তখন বাংলা অঞ্চল বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজভাষা বাংলা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ সময় গুলোতে দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছিল পুরো বাংলা অঞ্চল জুড়ে। পাল রাজা গোপাল এর আগমন বা ক্ষমতা প্রাপ্তিতে এক ধরনের শাসন শুরু। এরপর সেন এবং তারপর মুসলিম শাসন। বাংলাভাষা সে সময়গুলোতে ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা; সরকারি নয়। আর একটা অসুবিধা ছিল যে তখন বাংলাগদ্য সুসংবদ্ধ রূপ পায়নি।[৪] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৮০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সুসংবদ্ধ লিখিত গদ্য নেই। এর পিছনে প্রধান কারণটি হলো বাংলা ছিলো সাধারণের মুখের ভাষা এবং এর কোন দাপ্তরিক স্বীকৃতি ছিল না ফলে দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্র ইত্যাদি খুব একটা এ ভাষায় লেখা হয় নি কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। তাছাড়া আমরা এ পর্যায়ে গদ্য সাহিত্যের চিত্রও দেখি না। বরং কবিতার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য টিকে ছিল এবং যার নমুনা পাওয়া যায় সবই প্রায় কাব্য। এইটুকু কাজ ১৮০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কবিরাই করেছেন। সুতরাং গদ্য ১৮০০ সালের আগে পরেই সুগঠিত হতে শুরু করে তার আগে নয়। এখানে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত লেখকদের ভাষার আধুনিকায়নের মূল ব্যক্তি হিসাবে দেখতে পাই। প্রমথ চৌধুরীকে দেখি বাংলাকে চলিত রূপে নিয়ে আসতে।

(৪)

বাংলা আধুনিক রূপে আসতে শুরু করার পর তাকে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তার প্রধানটি হলো বানান রীতি ঠিক করা এবং অন্যটি একটি ভাষা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সম্পৃক্ত পণ্ডিতগণ এবং ১৮ শতকের অন্য বাঙালি লেখকগণ মিলে একটা বানান রীতি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কাজটা এতটা সহজ ছিল না। ভাষাকে সঠিক গ্রহণযোগ্য বানান ও নিয়ম নিশ্চিতই একটা ভাষা নীতি এবং ভাষা পরিকল্পনার অংশ। বাংলাদেশের ভাষানীতির ইঙ্গিত বা মূলনীতি আছে। '৭২ সালের সংবিধানে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের ভাষা হবে বাংলা। কিন্তু নানা কারণে সর্বতোভাবে বাংলাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে এখনো, এখানেই ভাষা পরিকল্পনার সমস্যাটি। রাষ্ট্রকেই সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। বাংলাদেশের কোন ঘোষিত ভাষা পরিকল্পনা আছে কি না তা জানা যায় না। তবে সংবিধানের মূলনীতি ধরে বিভিন্নভাবে বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অবশ্য দেখা যায়। বাংলা একাডেমি যে ব্যাকরণ প্রকাশ করেছেন সেটি[৫] এবং এর বানান রীতির বিষয়টি পরিকল্পনারই অংশ মনে হয়। এ ধরণের একট উদ্যোগের ভেতর একটা বৃহত্তর সংশ্লিষ্টতার প্রশ্ন আসে। কেননা বাংলা ভাষাভাষীদের একটা বড় অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আছেন; সুতরাং একটা যৌথ উদ্যোগের প্রশ্ন কিন্তু এসে যায়। তবে যাই হোক বানান নিয়ে জটিলতা কিন্তু শুরু থেকেই ছিল। শুরুর দিকের একদল লেখক সংস্কৃত প্রভাবিত বানান এবং অন্যদল যারা পরে যুক্ত হয়েছেন লেখালেখিতে আরবি-ফারসি প্রভাবিত বানান ও বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন।[৬] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ বিশৃঙ্খলার বাইরে থাকতে পারেননি এবং একটা সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক নীতি কামনা করেছেন আমরা আগেই দেখেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বানান নীতি একটা তৈরী করেছিল পর্যন্ত। কিন্তু তারা প্রচুর বিকল্প বানান রেখে দিয়েছিলেন। ফলে সমস্যা যায় নি। বাংলা বানানের আর একটি সমস্যা হলো ব্যক্তি বিশেষ এবং প্রতিষ্ঠান বিশেষ নিজস্ব বানান রীতি মেনে লেখালেখি করেন। উদাহরণ হলো ভারতের আনন্দ বাজারের নিজস্ব বানান রীতি আর বাংলাদেশের প্রথমা প্রকাশনী এবং প্রথম আলোর নিজস্ব বানান রীতি। বর্তমানে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির নেতৃত্বে ব্যাকরণ এবং বানান এর একটি গ্রহণযোগ্য নিয়ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে। এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষজ্ঞদেরও সম্পৃক্ততা আছে এবং সে উদ্যোগ অনুসারে ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে- অভিধান প্রকাশ হয়েছে। আবার বাংলাদেশ সরকার সরকারি কাজের জন্য বাংলা একাডেমির বানানের আলোকে একটা পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন যেন সরকারি কাজের লেখাগুলোতে বানান ঠিক থাকে।[৭] এত কিছুর পরেও বানান নিয়ে সমস্যা পুরোপুরি দূরীভূত হয়নি।

(৫)

বাংলাভাষা ব্যবহারের সঙ্গে রাজনীতিরও একট যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলা ভাষা হিসাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত সেভাবে কখনোই আনুকূল্য পায়নি। তার পেছনের কারণ রাজনীতির। শুরুতে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত, তবে এখনও বাংলা ভাষা হিসাবে বর্তমান আদলে পৌছায়নি। তারপর মুসলিম আমলে যেখানে ফার্সি রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা ছিল। বাংলা অঞ্চলের শাসক আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মত কেউ বাংলাকে আনুকূল্য দেখালেও ফার্সিই সরকারি ভাষা হিসাবে থেকে যায়। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা আধুনিক রূপে আবির্ভূত হলেও তা সরকারি ভাষা হয়নি। ফার্সির বদলে আস্তে ধীরে রাষ্ট্রের ভাষা হয় ইংরেজি। ফলে শাসক শ্রেণি সব সবময়ই সাধারণ মানুষের ভাষার বদলে এমন একটি ভাষাকে রাষ্ট্র চালনা করার মাধ্যম হিসাবে রেখেছিলেন যেন শাসক গোষ্ঠীর অভিজাত্যের ভঙ্গিটি বহাল থাকে। ফলে শাসকশ্রেণি এবং সাধারণ মানুষের বিশেষ গৌরব দিতে এ প্রক্রিয়া চলেছে রাজনীতির কৌশল হিসাবেই। পাকিস্তান আমলে বিষয়টা একটু বদলে যায় বাঙালিদের সচেতনতায়। পাকিস্তানের শাষকশ্রেণির বাংলার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিকভাবে বাঙ্গালিদের ধ্বংস করে দিয়ে শাসক শ্রেণীর বশংবদে পরিণত করা। এটাও ঐ রাজনীতি; সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধীনস্ত করে সংখ্যালঘুর শাসন সুসংহত করা। এখানেও কিন্তু একটা বাঙালি কোটারী কায়েমী স্বার্থবাদী শাসক চক্রের সহযোগী ছিল। ব্রিটিশ আমল বা তারও পূর্বে এদেশীয় অনুচরদের আমরা দেখেছি। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ দ্বিবিধ ছিল (i) ধর্মতাত্ত্বিক এবং (ii) ভাষাতাত্ত্বিক। ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছিল বাংলা ভাষা হচ্ছে হিন্দু প্রভাবিত ভাষা সুতরাং মুসলিম সংস্কৃতির স্বার্থে এর সংস্কার প্রয়োজন। এমনকি অক্ষর পরিবর্তনের উদ্যোগেও লক্ষণীয়। অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে তাদের বক্তব্য ছিল বাংলাভাষা গঠনগতভাবে দুর্বোধ্য এবং জটিল। সুতরাং এর সংস্কার প্রয়োজন। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ সালে একটি কমিটি করা হয়েছিল মৌলানা আকরাম খানকে প্রধান করে। কমিটি ১৯৫০ সালে রিপোর্ট দিলেও তা প্রকাশ করা হয়নি ভয়ে। ১৯৫৮ সালে তা প্রকাশিত হয় সেনা শাসনের সময়ে। তিনটি অসুবিধার প্রসঙ্গে তারা তুলে ছিলেন। (i) ভাষার ভেতর সংস্কৃত প্রভাব (ii) ভাষার অসরলতা এবং (iii) বাংলা অক্ষরের আঞ্চলিক চরিত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালীদের প্রতিরোধের সামনে এসব আয়োজন টেকেনি।

কিন্তু স্বাধীনতার পরও রাজনৈতিক কূটচাল বাংলা ভাষার পিছু ছাড়েনি। ভঙ্গি এবং রূপ বদলে সেই বিভাজনের কাজে বিষয়টিকে ব্যবহারের চেষ্টা আমরা দেখেছি। এছাড়াও একদল সুবিধাভোগী নানা অজুহাতে একট এলিট ভঙ্গির জন্য ইংরেজির পক্ষ্যে থাকল। বলা হলো বাংলায় উপযুক্ত বই, তথ্যউপাত্ত এবং পরিভাষা নেই। সুতরাং সর্বস্তরে বাংলা চালুর বাধ্যবাধ্যকতা সত্ত্বেও তা পুরো চালু হলোনা। একটা আইন হলো ১৯৮৭ সালে তবুও সুরাহা হলো না।[৮] তবে এ কথা ঠিক যে বাংলাতে এই বাক্য বা পরিভাষার সমস্যা

আছে। কিন্তু তা আছে কেননা বাংলা ভাষা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের আনুকূল্য পায়নি। ফলে পরিভাষা তৈরির জন্য যে চর্চা তা আর হয়নি। বিশেষভাবে বিজ্ঞান চর্চা এবং আইনের ক্ষেত্রে। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবতন হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পরিস্থিতি বিচারে বিভিন্ন প্রয়াস এর ফলে খটকা থেকেই যাচ্ছে। শ্রেণিবিভক্ত পরিস্থিতিতে সবসময়ই উচু শ্রেণির মানুষেরা সুবিধা ভোগের জন্য একটা স্বাতন্ত্র্য তৈরির চেষ্টা করে। সে প্রতিবন্ধকতা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এখনো আছে।

(৬)

বাংলা ভাষার আইন সম্পৃক্ততার ইতিহাস অনেক পুরানো। ব্রিটিশ আমল থেকে। কিন্তু সে সম্পৃক্ততা অফিসিয়াল ছিল না; বরং স্থানীয়দের প্রক্রিয়াটির ভেতর রাখার জন্য সেটা করা হয়েছিল। এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। ফাঁকিটা হলো আইনের অনুবাদ করা হয়েছিল বাংলাভাষীদের আইনি কাঠামোর ভেতরে রাখা এবং তাদের সেটা অনুধাবনের সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু অনূদিত বাংলা পাঠ দাপ্তরিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে একথা ঠিক আইনের ঐ অনূদিত বইগুলিই ছিল বাংলা গদ্যের শুরুর নমুনা।

আইনের বাংলা ভাষ্য তৈরির প্রয়াস আমরা ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই দেখি। তখন সরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রথমে ইংরেজ কর্মচারীরা এবং পরবর্তী দেশীয়রা আইনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতেন। প্রাচীন বা মধ্যযুগে আইনী কাঠামো সুসংহত ছিল না সেভাবে আর অনুবাদের প্রশ্নও ছিল না সে কারণে। মধ্যযুগের যে সব তথ্যউপাত্ত আমাদের হাতে আছে তা থেকে দেখা যায় সরকারি কাজকর্ম ছিল ফারসি ভাষায়, এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনগণের সম্পর্কও ছিল না। সুতরাং বাংলা ভাষায় আইন বা আইনের অনুবাদ তৈরির উদ্যোগ শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন সংহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। ব্রিটিশ সরকার বা কোম্পানি শাসন চলাকালে শাসনের সুবিধার জন্য এদেশীয় ভাষা জানা এবং এদেশীয় ভাষায় নিয়ম-কানুন প্রচারের আবশ্যকতা ছিল। কোম্পানি গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার কাউন্সিলের মাধ্যমে। শুরুতে ফারসি এবং বাংলায় ইংরেজিতে প্রণীত আইনগুলো অনুবাদের উদ্যোগ নেয়া হয়; পরে শুধু বাংলা প্রাধান্য পেয়েছিল; যখন সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসি বাদ হয়ে যায়। তাছাড়া ফারসি ভাষার প্রচলন সাধারণ মানুষের ভেতর না থাকায় তা অচিরেই তিরোহীত হয়ে যায়। জনসন ডাকনান কোম্পানির একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রথম ইংরেজি আইনের বাংলা অনুবাদ করেন। প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে প্রণীত ১৭৮১ সালের একটি আইনের অনুবাদ করেন ডানকান। ডানকানের পর গুরুত্বপূর্ণ নামটি হলো বেনজামিন এডমনস্টোন। ১৭৮৪ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত মোট ১৯টি আইনগ্রন্থ বাংলাতে প্রকাশ হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮০০ সালের পর বাঙালীদেরও অনুবাদ কর্মে অংশ নিতে দেখা যায়। তবে একথা বলতেই হবে আইনের ভাষা হিসেবে বাংলা একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিশেষ বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

ব্রিটিশ শাসন আমলের পর পাকিস্তান আমলে বাংলার উপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছিল সে রকম প্রেক্ষাপটে বাংলায় আইন তৈরি অথবা আইনের বাংলা সম্পৃক্ততার কোন প্রশ্নই ছিল না। সুতরাং বাংলার সঙ্গে পুরো পাকিস্তান আমল জুড়েই সঠিকভাবে দিমাতার আচরণ বহাল ছিল।

স্বাধীনতার পর শুরু হলো বাংলার জয়যাত্রা। সেখানে প্রথম আইনটি হলো দেশের সংবিধান। হাজার বছরের অভিঘাতের পর বাংলা ভাষায় একটি জাতি তার সংবিধান রচনা করল।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ।

> *১৫৩। (১) এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান-প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।*
>
> *(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।*
>
> *(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে;*

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

অনুচ্ছেদটি স্পষ্টভাবেই জানাচ্ছে যে বাংলাদেশের সংবিধানের দু'টি পাঠ থাকবে একটি বাংলা এবং অন্যটি ইংরেজি; আর বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। প্রাধান্য প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ দেয় বাংলা হচ্ছে মূলপাঠ। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ড্রাফট হয়েছিল ইংরেজিতে এবং বাংলা ভাষ্যটি অনূদিত।

বঙ্গবন্ধু নিজে সর্বস্তরে বাংলা চালুর বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে প্রবাসী সরকারকে অনুধাবনযোগ্য কারণেই ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে বাংলা চালুর চেষ্টা শুরু হয়। প্রতিবন্ধকতা ছিল ভেতরেই। উচ্চ কোটির ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি পরিভাষার অভাব, আন্তর্জাতিক ভাষার দোহাই বা পর্যাপ্ত বইপত্রের অভাব নানা দোহাই দিয়ে তা ঠেকিয়ে রাখে। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৭ সালে একটা আইন করা হয় বাংলা ভাষা প্রচলন আইন।[৯]

তবে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহারের মূল উৎস হচ্ছে দেশের সংবিধান। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলা হয়েছে।[১০] এই নির্দেশনাতে রাষ্ট্রভাষা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে রাষ্ট্রের সব অঙ্গের জন্যই এ ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান।

অনুচ্ছেদ ১৫৩ অনুসারে সংবিধানের বাংলা পাঠই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং বাংলা ব্যবহারের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। ১৯৮৭ সালের বাংলা প্রচলন আইন অনুসারে সর্বত্র বাংলা ব্যবহৃত হবার কথা এবং আইনটি সংবিধানের আলোকে তৈরি। কিন্তু আইনটি প্রয়োগের শুরুতেই এক মামলার জটিলতায় পড়ল এবং উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং সর্বত্র ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ল। *মোহাম্মদ হাসমত উল্লাহ বনাম আজমেরি বিবি*[১১] মামলাটিতে নিম্ন আদালতে একটি ইংরেজিতে লেখা আরজি খারিজ করার ফলে বাদী পক্ষ উচ্চ আদালতে আসেন। উচ্চ আদালত সিভিল প্রসিডিউর এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এর বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে ইংরেজি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত দেন। তারা বলেন সিভিল প্রসিডিউর এর ধারা ১৩৭ (২) এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ধারা ৫৫৮ অনুসারে আদালতের ভাষা ইংরেজি হতে পারে। একই সঙ্গে বলেন, ১৯৮৭ সালের বাংলা প্রচলন আইনে কোন ধরনের Nonobstanti Clause না থাকায় অন্য আইনগুলোর উপর এর প্রভাব থাকছে না এবং এটা একটা সাধারণ আইন; অন্যদিকে সিভিল প্রসিডিউর একটা বিশেষ আইন। এই সিদ্ধান্তটি নিশ্চিতভাবেই সর্বস্তরের বাংলা চালুর ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে দিয়েছে। যদিও সিদ্ধান্তটি সাংবিধানিক Spirit এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবিধান অনুসারে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন বাতিল।

এতে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৭ সালের আইন সংবিধানের বাংলা সংক্রান্ত বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু আলোচ্য রায় এবং সেখানে উল্লিখিত বিষয়গুলো সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে যে সকল আইন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তা বাতিল। সুতরাং বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। ১৯৮৭ সালের আইনের আগেই ১৯৭৫ সালে[১২] এবং ১৯৭৮ সালে[১৩] দুবার প্রশাসনিক আদেশ জারি করে সর্বস্তরে বাংলা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু এ প্রয়োগ পুরো কাজে আসেনি তখন।

এরকম নানাবিধ জটিলতার ভেতর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত বেশ কিছু মামলায় বাংলায় রায় দিতে শুরু করেছেন। এ পর্যন্ত বেশ অনেকগুলো মামলার রায় বাংলায় প্রদত্ত হয়েছে। এর ফলে একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যার মাধ্যমে বাংলায় আইনী পরিভাষা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। নিম্ন আদালতেও দেখা যাচ্ছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আদালতের কার্যক্রম বাংলাতেই চালু হয়েছে। বিভিন্ন দরখাস্ত দাখিল, আদেশ, রায় ইত্যাদি বাংলাতে দেয়া হচ্ছে। এর বাইরে পার্লামেন্টে কৃত সাম্প্রতিক আইনগুলোও বাংলাতেই করা হচ্ছে এবং ক্ষেত্রমতে এর একটি গ্রহণযোগ্য ইংরেজি পাঠ রাখা হচ্ছে। এইটি একটা বড় অর্জন এজন্য যে স্বাধীনতার পরও আইন সমূহ বাংলাতে তৈরি হচ্ছিল না; উদাহরণ হিসাবে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের কথা বলা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি আইন তৈরির ক্ষেত্রে অন্তত বাংলার অনুকূলে এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো এই যে এক ধরণের অনুকূল পরিস্থিতি বাংলাভাষার আইনী পরিসরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা সর্বব্যাপী হচ্ছে না কেন বা স্বাধীনতার এত দশক পরেও পূর্ণতা পাচ্ছে না কেন? চ্যালেঞ্জটা কী? এর উত্তর নানাবিধ।

প্রথমত, মানসিক প্রতিকূলতা; আমরা আইন আদালতে বাংলার সর্বব্যাপী ব্যবহারে এখনো মানসিকভাবে প্রস্তুত নই বা ক্ষেত্র বিশেষে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি বা বাহানা তৈরি করি। এই মানসিকতাটা আসে ব্রিটিশ ঐতিহ্য থেকে। আমাদের আইনী কাঠামো এবং শিক্ষা কাঠামো উভয়টিই ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত; ফলে ইংরেজি ভাবধারা প্রসূত। সুতরাং এ প্রক্রিয়ার ভেতরে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে একটা ইংরেজি প্রীতি অনুভব করেন এবং সেটা একটা আলাদা শ্রেণিগত প্রণোদনাও দেয়। দ্বিতীয়ত, আইনী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের জন্য বা অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি ভাষা প্ররিকল্পনা বা প্রয়োজনীয় ভাষা নীতির অভাব আছে সরকারিভাবে। এখানে ভাষা পরিকল্পনা এবং ভাষা নীতি দুটো পদই ব্যবহার করেছি, এজন্য যে দুটোর ভেতর পার্থক্য আছে। ভাষা পরিকল্পনা হলো আয়োজন এবং নীতি হচ্ছে প্রয়োগের ব্যবস্থাপনা, তৃতীয়ত, আইনী বই-পত্র এবং পরিভাষাগত সমস্যা। আইনী পরিসরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো প্রয়োজনীয় বই-পত্র, তথ্য-উপাত্তের অভাব এবং একই সঙ্গে অন্যভাষা থেকে অনুবাদ করে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিষভাষাজনিত জটিলতা। এমনটি হবার কারণ হচ্ছে বাংলাভাষা আইন-আদালতে পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত না হওয়া এবং এর দাপ্তরিক ব্যবহার না থাকা। কোন ভাষায় বই-পত্র বা পরিভাষা এমনিতেই গড়ে ওঠে না; সেজন্য এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার ও উদ্যোগ প্রয়োজন হয়। বাংলা সেক্ষেত্রে সব সময় অবহেলিতই থেকেছে। ফলে এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রয়োগ করতে গিয়ে বাংলাকে এসব প্রতিবন্ধকতা পোহাতে হচ্ছে। চতুর্থত, আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের, বিশেষ করে উচ্চ আদালতের একটা বিশ্বব্যাপী মূল্য আছে নমূনা হিসাবে; সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি অধিক্ষেত্রেও অন্যদেশের বিচারিক সিদ্ধান্ত ক্ষেত্র মত ব্যবহৃত হয়। সেগুলোও স্বভাবতই ইংরেজিতে লিখিত; এবং তা ব্যবহারের সময় অনুবাদের প্রশ্ন আসে তা নিতান্তই জটিল কাজ।

এখন কথা হচ্ছে এসকল প্রতিবন্ধকতা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলার যে ব্যবহার শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ব্যবহার করতে করতেই প্রয়োজনীয় সমাধানসমূহ সম্ভব হবে। সব ভাষাতেই বিষয়টি এমনই। এখানে বলা দরকার যে, সাধারণভাবে আমরা যেসব ভাষা ব্যবহার করি তার সঙ্গে আইনী ভাষার পার্থক্য আছে। ভাষার যে ক্যাটাগরি বাংলা ভাষার জন্য মাইকেল ওয়েস্ট তার *Bilingualisim* গ্রন্থে দেখিয়েছেন তার দ্বিতীয়টিই হলো আদালতী রীতি।[১৪] ইংরেজী ভাষাকে যদি উদাহরণ হিসাবে ধরি আমরা দেখি প্রচুর ল্যাটিন শব্দসহ আদালতের জন্য একটি ভিন্ন আঙ্গিক আছে ভাষার। এটা হয়েছে যেন দ্ব্যর্থবোধক মনে না হয় কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সে জন্য। বাংলাতেও বিষয়টি এক; সুতরাং এর ক্রমাগত ব্যবহারই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বাইরে আসতে সাহায্য করবে।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান আমলে বাংলার বিষয়টি সরকারিভাবে অবহেলা করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। স্বাধীনতার পর বাংলা যথাযথ গুরুত্ব লাভ করলেও আইনের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সময় লেগেছে এবং এখনো পুরো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করার জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলায় আইনের যে বিষয়টি উপরে বলা হলো তা হচ্ছে মূল আইনের অনুবাদ এবং তা আদালতে 'গ্রহণযোগ্য পাঠ' হিসাবে বিবেচ্য ছিল না; বিবেচ্য ছিল ইংরেজি পাঠ। তাছাড়া অনুদিত বাংলা পাঠ ছিল প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাবে দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় সরাসরি কখনই আইন প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানই হল বাংলা ভাষায় প্রণীত প্রথম আইনী দলিল।

(৮)

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর একটি স্বাধীন দেশের সংবিধানের বাংলা পাঠ তৈরি যথেষ্টই কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজ ছিল। বাংলায় আইন বা সংবিধান লেখার মুল প্রতিবন্ধকতা ছিল যথাযথ পরিভাষার অভাব। আবার একটু পিছনে তাকাতে হবে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য। ব্রিটিশ আমলে জনাথন ডানকান যখন বাংলায় আইনের অনুবাদ শুরু করেন তখন তিনি এবং তার উত্তরসূরীরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলার ভেতর ফারসি বা সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদেশীভাষার আধিক্য ঘটিয়েছেন পরিভাষা তৈরির জন্য। ঐ সময় এবং পরবর্তী সময়ের বাংলায় প্রকাশিত আইনগুলো দেখলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ফলে বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা পাঠ তৈরির সময় পরিভাষা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়। পরিভাষা বলতে বোঝানো হচ্ছে যথাযথ পরিভাষা।

পরিভাষা বা স্পষ্ট করে বললে যথাযথ ভাষায় সংবিধান তৈরি জরুরি এ জন্য যে, সংবিধান যে কোন দেশের ক্ষেত্রেই সকল আইনের উৎস এবং সকল আইনই সংবিধানের আলোকে বিচার্য। সুতরাং ভাষার দ্ব্যর্থকতা বা পরিভাষাগত জটিলতা নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে বা আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করতে পারে। এসব বিষয় সামনে রেখে এবং বাংলার আইনী পরিভাষার সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই শুরু হয় সংবিধানের বাংলা পাঠ তৈরির কাজ। মনে রাখতে হবে ইংরেজি ভাষা পর্যন্ত আইনের সব যথাশব্দ না পেয়ে অসংখ্য ল্যাটিন শব্দ আত্মীকরণ করেছে শুধু সঠিক আইনী ভাব প্রকাশের স্বার্থে।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হলে এর বাংলা পাঠ তৈরির জন্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অনুবাদের সাহায্যকারী হিসেবে দু'জনকে সঙ্গে নেন; একজন হলেন নেয়ামাল বাসির এবং অন্যজন এ কে এম সামসুদ্দিন। অনুবাদক দলের আনুষ্ঠানিক

স্বীকৃতি ছিল কমিটি কর্তৃক। পরে অন্য একটি বিশেষ কমিটি হয়, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে; কমিটির অন্য দু'জন ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং মযহারুল ইসলাম।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে ঢাকায় অনুবাদের কাজ করছিলেন। তিনি তার সহকারিদের নিয়ে ইংরেজি ড্রাফটের যথাযথ বাংলা করে চলছিলেন কিন্তু নানা কারণে কোথাও কোথাও বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা যায় নি। যেমন স্পিকার শব্দটিকে তারা বাংলা পাঠেও রেখে দেন। আবার ওমবুডজম্যান শব্দটিকে তারা ন্যায়পাল হিসেবে অনুবাদ করেন। শব্দটি উদ্ভাবন করেন তার সহযোগী নেয়ামাল বাসির। অনুবাদের সময় তারা কিছু নিয়ম মেনে অনুবাদ করছিলেন যেন বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের ভেতর ভবিষ্যতে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়। ইংরেজিতে বহুবচন ব্যবহার হলে বাংলাতেও তারা বহুবচনই ব্যবহার করেছেন। খসড়া চূড়ান্তকরণের সময় ব্রিটিশ বেসরকারি বিল প্রস্তুতের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী রবার্ট গাথরীকে নিয়ে আসা হয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে। তিনি ইংরেজি পাঠের পাশাপাশি বাংলা পাঠের উন্নয়নেও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে সাহায্য করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটি ত্রুটিমুক্ত বাংলা পাঠ তৈরি করতে পেরেছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও তাঁর সহকারীগণ। এখানে বলা দরকার সংবিধান প্রণয়ন যখন চলছিল তখন সংগত কারণেই সংবিধান প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাক্তিবর্গ বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিচ্ছিলেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন হওয়ায় তাঁর সুযোগ হয়েছিল সংবিধান বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর মনোভাব অনুধাবন করার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্লোর ক্রসিং বন্ধের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পরবর্তিতে খুবই ফলদায়ক হয়েছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক মনোভাবটি সংবিধান রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ ধারন করতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লেখা থেকে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধু সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন।

সংবিধানের বাংলা পাঠ তৈরির কাজ এবং এর পরিভাষা যে যথাযথ ছিল স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর তা প্রমাণিত। কেননা সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন ভাষাগত জটিলতার প্রশ্ন ওঠেনি। এ পর্যন্ত অন্তত: দু'বার উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে বাংলা পাঠের প্রাধান্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। মামলা দু'টি হল: ১. ওসমান গণি মণ্ডল বনাম মাঈনুউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য এবং ২. ফজলুল হক চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ। মামলা দু'টি যথাক্রমে ২৭ ডি এল আর (আপিল বিভাগ) পৃ. ৬১ এবং ৩০ ডি এল আর (হাইকোর্ট বিভাগ) পৃ. ১৪৪- এ প্রকাশিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই বাংলা পাঠে কোন জটিলতা নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৯)

বর্তমান প্রবন্ধের প্রকৃত পক্ষে কোন উপসংহার দেওয়া এ পর্যায়ে সম্ভব নয়; এজন্য যে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে এবং এর আইনি পরিভাষা নিয়ে কোন স্পষ্ট সমাধানে বা নির্বিঘ্ন ব্যবহারের পর্যায়ে এখনো পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। সুতরাং উচিত হবে ইতোমধ্যেই শুরু হওয়া পরিভাষা তৈরির কাজ বাংলা ভাষার সর্বত্র ব্যবহারের মাধ্যমে একটা পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৩।

২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫৩ (২)।

৩. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *রবীন্দ্র রচনায় আইনি ভাবনা* (ঢাকা: ইউপিএল, ২০২০), ১।

৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), হুমায়ুন আজাদ, *লাল-নীল দীপাবলি* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০)।

৫. *প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪)।

৬. গোলাম মুরশিদ, *বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য*, (ঢাকা: প্রথমা ২০১৯) ১৮৯-২০১।

৭. *সরকারী কাজে ব্যবহারিক বাংলা* (ঢাকা: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)।

৮. *বাংলা ভাষা প্রচলন আইন* ১৯৮৭ ।

৯. *প্রাগুক্ত*।

১০. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৩।

১১. ৪৪ ডিএলআর (ঢাকা: ডিএলআর প্রকাশন), ৩৩২-৩৩৮।

১২. *বাংলা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ*, ১৯৭৫ সংখ্যা ৩০/১২/৭৫, সাধারণ ৭২৩/১, (৪০০) ১২ মার্চ ১৯৭৫।

১৩. *বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারী আদেশ* ১৯৭৮ (১২ জানুয়ারি, ১৯৭৯)।

১৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, আয়েশা বেগম, *আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ একটি শৈলীগত বিশ্লেষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০)।